বিসাশন

পিয়া সরকার

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

প্রাককথন

সেই কোন ছোটবেলায়, যখন সবে রাজা-রাণী-রাজপুত্র-রাজকন্যা আর রাক্ষস খোক্ষসের জগত ছেড়ে বেরিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে মেয়েটির হাতে এসে পড়েছিল একটি আশ্চর্য গল্প। গল্পের নাম 'রক্ত-খদ্যোত'। সদ্য কিশোরীবেলায় পৌঁছানো একটি মেয়ে সেই প্রথমবার বুঝতে পারল, ভাঁটার মত চোখ আর হাড়গোড় কাঁপানো অট্টহাসির জগতের পাশাপাশি অন্য আরেকটি ভয়ের দুনিয়া আছে। সেই দুনিয়ায় ভয় খুব ধীরপায়ে আসে, কাঁচের জানালায় মুখ ঠেকিয়ে চুপটি করে অপেক্ষা করে, হিমেল রাতে বাথরুমে যাওয়ার সময় পিছন পিছন ঘোরে। কখনও বাগানের ঝাঁকড়ামাথা গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে মেঘঢাকা চাঁদের মুখ দেখতে দেখতে, কখনও বা দূরের দেশে বেড়াতে গিয়ে রাজপ্রাসাদের কালো লম্বা ছায়ার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠত মেয়েটি। মেয়েটি জানত, আসলে আমাদের চার পাশের সেই সব ছবিতেই লুকিয়ে থাকে ভয়। আদিম, অপ্রতিরোধ্য ভয়। ধীরে ধীরে ভয়াল জগতের আঙিনায় ঢুকল সে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র পাল, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবাদপ্রতিম কথাশিল্পীর অলৌকিক গল্প গোগ্রাসে পড়তে শুরু করল মেয়েটি। নিজে যখন হাতে কলম তুলে নিল তখন স্বাভাবিকভাবেই অলৌকিক ঘরানার গল্পের দিকেই আকৃষ্ট হল সে। শোনাতে চাইছিল তার নিজস্ব কিছু বিবরণ, ভাগ করে নিতে চাইছিল নিজের কিছু অনুভূতি। তবে শুধু অনুভূতি দিয়ে তো আর গল্প হয় না, গল্পের জন্য একটা কাঠামো দরকার। দরকার জবরদস্ত প্লট। সুযোগ এসে গেল একদিন। ঠাণ্ডা বাতাসের সাথে, অসহ্য শূন্যতার সাথে, বৃষ্টির ঝপ ঝপ শব্দের সাথে তার মনের ভয়গুলিকে মিলিয়ে মেয়েটি তুলে নিল কলম।

সময়টা দুহাজার সতেরো সালের ডিসেম্বর মাস। পরিবারের সাথে বছরশেষের ছুটিতে সে বেড়াতে গিয়েছিল বীরভূম জেলার আকালীপুর গ্রামে। যারা বেড়াতে ভালোবাসেন, তাঁরা জানেন আকালীপুর শ্মশানে, ব্রাহ্মণী নদীর তীরে অধিষ্ঠিত আছেন এক ভয়ংকরী কালীমূর্তি, যাঁকে স্বয়ং মহারাজ নন্দকুমার বারাণসী থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন আকালীপুরে। মন্দিরটিতে যে সময় পৌঁছেছিলেন ওঁরা, সেইসময় দ্বার প্রায় বন্ধ হয় হয়। সদাব্যস্ত শ্মশানে সেইমুহূর্তে অদ্ভুত নীরবতা। গুটিকয় প্রাণী মন্দির দর্শনের ইচ্ছায় দাঁড়িয়ে আছে। স্থানীয় কিছু মানুষও রয়েছেন ওঁদের আগে। দূরে দক্ষিণে পঞ্চমুণ্ডীর

আসনে কটি ধূপদ্বীপ জ্বলছে। সেখানেও কাকপক্ষী নেই। মন্দিরের গঠনটিও ভারী অদ্ভুত। লোকের মুখে নানা কথা শুনতে শুনতে ওঁরা এগিয়ে গেল মন্দিরের ভিতরে। প্রায় দেড় ফুট উঁচু বেদীর উপর সর্পভূষিতা দেবীর দুশ বছরের প্রাচীন বিগ্রহ। উত্তরমুখী দেওয়ালে এক বিরাট ফাটল। জনশ্রুতি, বিশেষ এক কারণে মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার সময় ফেটে গিয়েছিল মন্দিরের দেওয়াল। পূজার্চ্চনা শেষ হলেও, মেয়েটির মনের মধ্যে যেন প্রশ্নের ঝড় উঠল। কলকাতা ফিরে নানা বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে জানতে পারল মন্দির ও মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গুহ্যকালীর ইতিহাস। দুশ বছরের পুরোনো ইতিহাসে স্বাভাবিকভাবেই নানা লৌকিক ও অলৌকিক ধারা এসে মিশেছিল। তথ্যপ্রমাণ সুলভ নয়, তাই সঠিক ইতিহাস জানাও কঠিন ছিল। দীর্ঘ ছমাসের পরিশ্রমের পর সেই ইতিহাস ও নিজের কল্পনা মিশিয়ে সে লিখে ফেলল "ওমকারা"। এই বইয়ের ঐটিই প্রথম লিখিত নভেলা, ঐতিহাসিক হরর থ্রিলার।

"ওমকারা" লেখার সময়ে বইয়ের গল্প হিসাবে সে লেখেনি, ভেবেছিল কোনো পত্রিকায় পাঠাবে গল্পটিকে। যারা সে সময় পড়েছিলেন "ওমকারা", উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আরেকটি হরর নভেলা লিখে ফেলতে। ইচ্ছা তো প্রবল ছিলই, তারপর উৎসাহ পেয়ে দিব্যি ইতিহাস ঘাঁটতে শুরু করল মেয়েটি। এইভাবে জন্ম হল বইয়ের দ্বিতীয় নভেলাটির। "রক্তের রঙ বেগুনী", প্রেক্ষাপট লক্ষ্ণৌ। এটি বইয়ের সবথেকে বড় লেখা, সবথেকে বেশী সময়ও লাগল লিখতে। লক্ষ্ণৌর সুবিখ্যাত বাঈজী ঘরানা, নবাব ওয়াজেদ আলির শাহর পূর্বপুরুষ সাদাত আলি এবং কলকাতা শহরের এক সাধারণ নারীর জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই হরর থ্রিলারটিতে। জড়িয়ে আছেন লা মার্টিনিয়ার স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ক্লড মার্টিনও। গল্পের মূল প্লটটি নিয়ে ছোট একটি গল্প রংমশাল পত্রিকার ভয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকেই বলেছিলেন, প্লটটি উপন্যাসের। পাঠকের ভালোবাসা পাওয়ায় গল্পটিকে নভেলার রূপ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল খুবই। সেই ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয়েছে প্রথম প্রকাশিত বইতে।

"ওমকারা" এবং "রক্তের রঙ বেগুনী" এই দুটি গল্প লেখাকালীন একটি ঘটনা ঘটল। আদতে আনাড়ি বইটিতে প্রকাশিত হল "নিশিগন্ধা"। পাঠকের কাছ থেকে অকুণ্ঠ ভালোবাসা পেল গল্পটি। কোথা থেকে যেন অসীম আত্মবিশ্বাস এল, যে কলম ছিল নেহাতই শখের, তাতে বারবার শান দিয়ে চেষ্টা করা হল আরও ভালো, আরও ত্রুটিহীন লেখার। নিজের লেখাকে বারবার কাঁটা ছেড়া করে সে নিঃসংশয় হতে চেয়েছিল। ইতিমধ্যে লেখা হল বিসাশন, এবং হাতছানি। এই দুটি গল্প অপেক্ষাকৃত ছোট। বিসাশন গল্পটিতে নতুন একটি চেষ্টা করা হল, ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে একটু এক্সপেরিমেন্টেশন। বিসাশন আদতে

বিশ্ববরেণ্য বাঙালী সাহিত্যিকের অত্যন্ত বিখ্যাত একটি গল্পের প্রিক্যুয়েল।

নবীন লেখিকার এই প্রচেষ্টা দুঃসাহসিক নিঃসন্দেহে কিন্তু সার্থক কিনা তা পাঠক নির্ণয় করবেন। তাঁরা নিশ্চিত জানেন, ঐতিহাসিক পটভূমিকায় হরর গল্পগুলি লিখতে গিয়ে সবথেকে বেশি চিন্তিত হতে হয় কোনখানে। গল্পগুলি যেন কোনোভাবেই নীরস ইতিহাসের দলিল না হয়ে ওঠে। আবার অলৌকিকতার ছোঁয়ায় ইতিহাস বিকৃতি যাতে না হয় সেদিকেও প্রথম থেকেই সচেতন হওয়া দরকার। মোট কথা, বই লেখার এই প্রয়াস লেখিকার কাছে সহজ ছিল না। প্লট তৈরী করার পরেও কাঠামো গড়তে দীর্ঘ দুশো থেকে আড়াইশো বছরের ইতিহাস ঘাঁটতে হয়েছিল। সেই ইতিহাসের অলৌকিক আবহ রচনার সময় জাম্প স্কেয়ারের সঙ্গে বা বীভৎস রসের সঙ্গে খুব সাবধানে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে মিলিয়ে দিয়েছেন লেখিকা। এই বাঁধুনি কতটা মজবুত হয়েছে, তা বলবেন আপনারা, প্রিয় পাঠক। এতক্ষণে, প্রচ্ছদগুণে লেখিকার নামটি নিশ্চয়ই আপনারা লক্ষ্য করেছেন? তবে সেই বহুব্যবহৃত ডায়লগটি এখানে হয়ত আবার প্রযোজ্য। "হোয়াট ইস ইন এ নেম?" পিয়া সরকার নয়, শেষ পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টি আপনাদের মনে কতটা দাগ কাটতে পারল সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বইটিতে আপনাদের পছন্দের বিষয় যেমন পাবেন, অপছন্দের বিষয়ও নিশ্চয়ই থাকবে। গঠনগত সমালোচনা করে লেখিকার ভুল ত্রুটি শুধরে দিলে তিনি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। নিজেকে বিচক্ষণ প্রমাণ করার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই, তবুও বইয়ের শেষে সহায়ক গ্রন্থতালিকা উল্লেখ করা হল।

সবশেষে বলি, একটি বই তৈরী করার সময় শুধু লেখকের প্রচেষ্টাই তো সব নয়, তার সঙ্গে জড়িত থাকে আরও অনেক মানুষের নাম। লেখালেখিতে নিরন্তর উৎসাহদানের জন্য সম্পাদকদ্বয়, তমোঘ্ন দাশগুপ্ত ও পিউ দাশকে, প্রচ্ছদের জন্য শিল্পী কুশল ভট্টাচার্য্যকে, হরফসজ্জার জন্য ঋতুপর্ণা চক্রবর্তীকে এবং সমস্ত সংশয়ে পাশে থাকার জন্য মেন্টরগ্রুপ আনাড়ি মাইন্ডস টিমকে লেখিকা আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সুদূর পুরুলিয়া থেকে তথ্যসন্ধানে সাহায্য করেছেন সুখেন প্রামাণিক; তাঁর সঙ্গে ধন্যবাদ জানান সহকর্মিণী মৌমিতা নন্দন, কাজরী মুখোপাধ্যায়, তনুমিতা বসাক এবং অপরাজিতা দাশগুপ্তকে। বইয়ের প্রকাশক বেঙ্গল ট্রয়কা তাঁর প্রথম প্রচেষ্টাকে দুই মলাটের মধ্যে আবদ্ধ করে ধন্যবাদার্হ রইলেন। বিসাশন পাঠকের ভালোবাসা পাক, এই আশা রইল।

পিয়া সরকার
কলকাতা,
এপ্রিল, ২০২০

সূচিপত্র

হাতছানি	১৩
রক্তের রং বেগুনী	৪৭
বিসাশন	১০০
ওমকারা	১১৬

হাতছানি

সরাইঘাট এক্সপ্রেস নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে ঢুকেছে ভোর চারটেয়, আশ্চর্যজনকভাবে সময়ের প্রায় আধ ঘন্টা আগে। শীত শেষ হয়ে বসন্ত এসেছে, কিন্তু ভোরের দিকটায় হাওয়া এখনও শিরশিরানি ধরাচ্ছে চামড়ায়। আমার গন্তব্য ধুপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল। স্টেশন থেকে দূরত্ব প্রায় তিরিশ কিলোমিটার। আপাতত তিন বছরের পোস্টিং এই হাসপাতালে। এত সকালে সরাইঘাট বেছে নেওয়ার কারণ ডিউটিতে আমি আজই জয়েন করতে চাই, সকাল সকাল কোয়ার্টারে পৌঁছে লাগেজগুলো ধপাস করে নামিয়েই ডিউটিতে ছোটার পক্ষপাতী আমি নই।

হাতে এখন যথেষ্ট সময়, আপাতত একটা চায়ের দোকান খুঁজে বার করতে পারলেই গতরাতের মাত্র চার ঘন্টার ঘুমের কমতিটা পুষিয়ে যাবে। দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মের এই মাথায় কোনও চায়ের দোকান চোখে পড়েনি, এই প্ল্যাটফর্মেই যাদের সংসার তাদেরই এখনও ঘুম ভাঙেনি। চাদর মুড়ি দেওয়া কিছু শরীর এমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে এদিক ওদিক, যে খুব কাছে, খুব পাশে গিয়ে দাঁড়ালেও তাদের ঘুম ভাঙবে বলে মনে হয় না। ছেঁড়া চাদরের নীচে কুণ্ডলী পাকানো অবয়বগুলো গুনতে গুনতে প্ল্যাটফর্মের ওদিকটায় এগোই আমি। দূর থেকে যেন একটা কয়লার উনুনের ধোঁয়া জানান দিচ্ছে যে ওদিকেই চায়ের দোকান থাকলেও থাকতে পারে। হাতের ট্রলিটার হ্যান্ডলটা ধরে টানতেই বিপত্তি বাধালাম একটা, হ্যান্ডলটা ট্রলির পেছনের কভারটা ছিঁড়ে বেরিয়ে এল হাতে, আর প্রায় তিরিশ কেজির ট্রলিটা প্ল্যাটফর্মের নিস্তব্ধতা কাটিয়ে ধমাস শব্দে হাত থেকে ছিটকে মাটিতে এসে পড়ল। অবশ্য এই অতর্কিত শব্দে ঘুম ভেঙে বিরক্ত হওয়ার মত কেউ নেই। ট্রলির ভাঙা হ্যান্ডলটা হাতে নিয়ে, এদিক ওদিক তাকিয়ে কী করব ভাবছি, ঠিক তখনই পেছন থেকে একটা আওয়াজ পেয়ে ঘুরে তাকাতেই অবাক হয়ে গেলাম। যাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সে এককালের আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু হলেও দীর্ঘ তিন বছর তার সাথে আমার দেখা হয়নি। বলা ভালো, দেখা করার হাজারো প্রচেষ্টা সে ব্যর্থ করেছে। দিনের পর দিন ফোন ধরেনি, তাকে

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের অ্যাকাউন্টে খুঁজে পাওয়া যায়নি, গত তিন বছরের মধ্যে তার বাড়িতেও যতবার দেখা করতে গেছি ততবারই তার দেখা পাইনি। সব্যসাচী দাশগুপ্তর মুখোমুখি হচ্ছি বছর তিনেক পর, এম.ডি শেষ করার পর ওই কটা বছর জলের মতই কেটে গেছে।

মনের মধ্যে উঠতে থাকা হাজারো প্রশ্ন আর অজস্র অভিযোগের ঘূর্ণিঝড় সামলে চেনা মুখটার দিকে তাকিয়ে হাসলাম, "কী ব্যাপার! তুই এখানে?" সব্যসাচীও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল, দেখলাম হাসিটা এখনও একই রকম আছে। ট্রলিটাকে মাটি থেকে তুলতে তুলতে ও জবাব দিল, "হ্যাঁ, আমি তো লাস্ট তিন বছর ধরেই এদিকেই আছি।"

মনে পড়ে গেল, ওর পোস্টিং হয়েছিল তুফানগঞ্জের মেন্টাল হসপিটালে। শেষ খবর পেয়েছিলাম বছর দুয়েক আগে ওর বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে, সব্যর মার মুখে। সব্যসাচী দাশগুপ্ত, ওয়ান অফ দ্য ব্রাইটেস্ট স্টুডেন্টস অফ সায়কায়াট্রি, আইপিজিএমআর, তুফানগঞ্জের প্রায় নতুন নিউরোসায়কিয়াট্রি হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার পদে চাকরি করছে। হঠাৎ হিসেবটা মাথায় এল, তিন বছরের পোস্টিং আর সেই তিন বছরই প্রায় নিরুদ্দেশ... দুটোর মধ্যে যোগসূত্র আছে কি কোনও! ট্রান্সফারের চিঠি চলে আসা উচিত এতদিনে, আর বাধ্যতামূলক রুরাল পোস্টিংয়ের এই বিড়ম্বনা সেরে, এই পাণ্ডব বর্জিত জায়গা থেকে বেরিয়ে সব্যসাচীর মত ছেলের কেরিয়ার হওয়া উচিত কোনও ঝাঁ চকচকে শহরের বিত্তনন্দিত পরিকাঠামোয় মোড়া কোনও প্রাইভেট হাসপাতাল। মনে পড়ে, শেষ যেদিন ওর খোঁজে লেক রোডে ওর বাড়ি গিয়েছিলাম, কাকিমা মানে সব্যর মা খুব দুঃখ করেছিলেন। ছেলে বাড়িতে কম আসে, কম কথা বলে, যোগাযোগ রাখে না।

সব্যসাচী মিশুকে, হইহুল্লোড়বাজ কোনওদিনই ছিল না। এমনকি গ্রুপ ছবি তুলতে গিয়ে সবাই একে অপরের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ালেও, ও দাঁড়াত একটেরে কোনও একটা কোণে। ভাবতাম, এটাই ওর স্বভাব। থট রিড করার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল ওর, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। সেটা অন্য অনেকে না জানলেও আমি জানতাম। স্টুডেন্ট লাইফ আর ইন্টার্নশিপ মিলিয়ে সেই বারোটা বছরে সত্যি কথা বলতে সব্যসাচী দাশগুপ্তর বন্ধু বলতে সে অর্থে কেউ ছিল না, এক এই শর্মা বাদে। বাকিদের কাছে সব্যসাচী ছিল একসেনট্রিক, মুডি, জেদী, আত্মমগ্ন আর অবুঝ। তাই পিজি এনট্র্যান্সে দুর্দান্ত র‍্যাঙ্ক করে ও যখন সায়কিয়াট্রি বেছে নিল, বাকিরা অবাক হলেও আমি হইনি।

সেই প্রাণের বন্ধু সব্য যখন নিজের বাবা মায়ের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখে

না দেখলাম, তখন খুব রাগ হয়েছিল ওর উপরে। সেই এমবিবিএসের সময় থেকে ও আমার বন্ধু, এম ডিতে গিয়ে স্ট্রিম আলাদা হয়ে গেলেও একই হোস্টেল, একই রুম শেয়ার করাতে বন্ধুত্ব নিবিড় ছিল। ভাবতাম আমি হয়তো আইস ব্রেক করে ওর কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছি, কিন্তু... ওকে প্রশ্ন করলাম, "তুই কি কোনও কাজে এসেছিলিস আলিপুরদুয়ার? তোর পোস্টিং তুফানগঞ্জে না?"

"হুম, টাউন থেকে কটা জিনিস কেনার ছিল রে।"

সব্যর হাতে দেখলাম বেশ কটা প্যাকেট, সব কটারই মুখ বন্ধ, আকার দেখে মনে হয় বইয়ের প্যাকেট।

"কী এগুলো?"

সব্যসাচী অদ্ভুতভাবে ঠোঁটে আঙুল লাগিয়ে আমায় চুপ করতে বলে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। এতক্ষণে খেয়াল করলাম ওর চেহারার বেশ পরিবর্তন হয়েছে এই ক'বছরে। কণ্ঠার হাড় দেখা দিয়েছে, গাল চুপসে গেছে, নোসব্রিজ খাড়া ওর ছিলই, এখন গাল ভেঙে যাওয়ায় নাকের হাড়টা বেমানান ভাবে উঁচু দেখাচ্ছে। চেহারার সামগ্রিক মালিন্যের মধ্যে উজ্জ্বল দুখানি চোখের তারায় বিভ্রান্তির ছাপ। সব্যসাচী ফিসফিস করে বলে উঠল, "আস্তে বল, শুনতে পাবে।"

"কে শুনতে পাবে? কী শুনতে পাবে?"

সব্যসাচী কথার উত্তর দিল না। বুঝলাম ওর কিছু সমস্যা হচ্ছে। হোস্টেলে থাকতে এই ছেলেটার সাথেই রাতের পর রাত জেগে লেঁব্ল্যা, জেমস জয়েস, এরউইন ভন আলোচনা করেছি। পড়ার বইয়ের বাইরেও সব্যসাচীর অন্যান্য বিষয়েও প্রচুর আগ্রহ ছিল। অন্তর্মুখী হলেও ওকে এত লস্ট কোনওদিন আগে লাগেনি।

কথা ঘোরালাম, জিজ্ঞাসা করলাম "তোর চাকরি কেমন চলছে?"
"এই চলছে... বলে সব্যসাচী উদাস হয়ে গেল।"
"বাড়ি যাসনি কতদিন?"
"হুম, বাড়ি? তা যাইনি... অনেকদিন হল।"
"কাকু কাকীমা আসেন?"
আমার প্রশ্নে সব্যসাচী যেন শিউরে উঠল।

রক্তের রং বেগুনী

কাল রাতে ভামটা আবার এসেছিল, প্রায় প্রতিরাতেই আসে। এত দীর্ঘদিন ধরে ও আমার স্বপ্নে আসে, এখন তো মনেও করতে পারি না ঠিক কতদিন আগে ওকে প্রথম স্বপ্নে দেখেছিলাম।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে যখন শুয়ে থাকি, খুট করে কোথাও একটা দরজা খোলার আওয়াজ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভামটা হেলতে দুলতে আমার ঘরে ঢোকে, পায়ের পাতার কাছে এসে গন্ধ শোঁকে। ওর শরীরে একটা আঁশটে গন্ধ আছে, যেটা আমি ঘুমের মধ্যেও পরিষ্কার বুঝতে পারি। লেজটাকে উঁচুতে তুলে বেশ কয়েকবার তারপর পায়চারি করে, একটুখানির জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়, মুখে করে নিয়ে আসে একটা জ্যান্ত মাছ। তারপর আমার সামনে থাবড়া মেরে বসে মাছটার গলায় একটা কামড় বসায়। আমি বুঝতে পারি, মাছটা ছটফট করছে, ওর তেল চুকচুকে শরীরটা পিছলে পিছলে বেরোতে চাইছে ভামটার মুখ দিয়ে। ভয়ে আমি চিৎকার করে উঠি, আর আমার চিৎকার শুনে ভামটা স্থির চোখে আমার দিকে তাকায়। ওর সবুজ মণিগুলো কী বিদ্রুপ করে ওঠে আমায় দেখে! ঠিক এই সময়ই আবার দরজায় আওয়াজ হয়, আর ঘরের মধ্যে ঢুকতে থাকে একের পর এক ভাম, এক... দুই... তিন... দশ... একশ... হাজার... ওদের পায়ের শব্দে— শ্বদন্তের চকচকে সাদাটে ভাবটায়— খুব দম্ভ। পায়ের থাবাগুলোয় নখগুলো ভীষণ বড়, খুব সরু আর সূঁচালো। ওদের মধ্যে কেউ কেউ নখগুলো মেঝেতে ঘষে। শুকনো মেঝেতে শব্দ হয় খচ...খচ... খচ। তারপর দল বেঁধে ওরা একটাই মাছের উপর ঝাপিয়ে পড়ে, কামড়ে কামড়ে ছিঁড়ে খায় মাছটার অস্থি, মাংস, মজ্জা। অবিকল মানুষের মত ওদের মুখের হাঁ করা কালো গহ্বর দেখতে পাই আমি। রক্ত মাখা মুখের চারধার, জিভ বার করে চেটে নেওয়া বাকিটুকুও। সেই মুহূর্তে মনে হয় আমার চোখের পাতা কে যেন জোর করে বন্ধ করে রাখে, আর আমার চোখের বন্ধ পাতার নীচে আমার স্বপ্নেরা নিজেদের মত করে নিজেদের গড়ে, ভাঙে। ওদের কারুর উপরই আমার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। ওরা ঘোরে, ফেরে, আসে, আর হ্যাঁ... ভয় দেখায়।

এ স্বপ্নের শেষ নেই, প্রতি দিনে বা রাতে ঘুমপাড়ানি গানের মতই এই স্বপ্নরাই আমার ছায়াসঙ্গী। যদিও তমাল বলে, ভয়ের এই স্বপ্নগুলো আমি নাকি আগে দেখতাম না, চারমাস আগের অ্যাক্সিডেন্টটার পর থেকে এরা আমার প্রতি রাতের সঙ্গী। অ্যাক্সিডেন্ট মানে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে গিয়ে মাথায় ভালো মতন চোট পেয়েছিলাম। আমার স্মৃতিও আমার জন্যে খুব কম বরাদ্দ করেছে, অ্যাক্সিডেন্টের আগের কথা আমার কিছুই মনে নেই। আমি তমালকে অবিশ্বাস করি না ঠিকই, কিন্তু কেন যেন মনে হয় এই স্বপ্নগুলো আমি আগেও দেখেছি, প্রায়শই দেখতাম। কখনও একই স্বপ্ন বারবার, কখনও আচমকা নতুন স্বপ্ন, দিনে এক বার বা একাধিক বার, গতে বাঁধা কোনও ফর্মুলা নেই আমার স্বপ্নদের। কখনও রাস্তার মাঝে যেতে যেতে হঠাৎ হঠাৎ মাথাটা দুলে ওঠে, আমার চারপাশটা মোবাইল অ্যাপের ব্লারড ব্যাকগ্রাউন্ডের মত ধোঁয়াটে হয়ে যায়। তখন শুধু আমি থাকি, আর আমার স্বপ্নেরা। শিউরে উঠে, আঁতকে উঠে, চিৎকার করে উঠি। আমার মনে হয়, আমি ঠিক স্বাভাবিক নই। না মনে হয় না, আমি জানি আমি অস্বাভাবিক। শুধু যখন হুঁশ ফেরে, চোখের সামনে পরিচিত মুখগুলোকে দেখতে পাই, তখন মনে হয় পাগলামিটা খুব অল্প সময়ের জন্য বাসা বাঁধে আমার মধ্যে। আবার আমি স্বাভাবিক হয়ে যাই।

কাল রাতে ভামগুলোর মুখগুলো আমার খুব কাছেই ছিল, এতটাই কাছে যে ওদের সবুজ মণির চারপাশে জমাট বাঁধা লাল রক্তবিন্দুদের দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। আঁশটে গন্ধটা নাকের মধ্যে ভক ভক করে লাগছিল। ওদের লম্বাটে শরীরটায় ছোট ছোট পাগুলো কেমন যেন বিকৃত লাগে আমার। সাদা সাদা সরু সরু দাঁতের ফাঁকে ছটফট করতে থাকা মাছটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে নিল ওরা। মাছটার গায়ে কোনও আঁশ নেই, পাঁকাল মাছের মত শরীরটার কিছুক্ষণ পরে আর কোনও অস্তিত্ব থাকল না। চিৎকার করে উঠেছিলাম, হঠাৎ মুখের উপর একটা হাত চাপা পড়ায় আমার চিৎকারটা গোঙানি হয়ে মুখের মধ্যেই আটকে থাকল। ঘুম থেকে উঠে দেখি, মিতুল আমার পাশে বসে আছে। ওর চোখে ভয়, আমার পাশে এতদিন ধরে শুয়ে শুয়ে ও হয়তো জেনে গেছে মা কখন কীভাবে ভয় পায়! আসলে, স্বপ্ন আর বাস্তবের বাউন্ডারিটা আমার কাছে খুব ক্লোজ! কোথায় তারা মিশে যায়, কখন তারা দূরে সরে এ আমিও ঠিক করে বলতে পারি না।

আমি মীনাক্ষি, বয়েস বত্রিশ, মাঝারি গড়ন, শ্যামবর্ণা, সাধারণ মুখশ্রী। আমার একমাত্র অসাধারণত্ব আমার স্বপ্নেরা। ওরা আমার বর্তমান আর ওরাই আমার অতীতের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষীণ সূত্রও বটে। আমার স্বপ্নেরা আমায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। ওদের অসাধারণত্বটুকুই আমার। আর ওদের মুখোমুখি না হওয়াটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

লখনউতে এখন যে জায়গায় আমরা আছি সেটা সুবিখ্যাত লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সির কাছেই, গোমতী নদীর ক্ষীণ রেখা আর বড়া ইমামবাড়ার সুউচ্চ মিনার আমার বাড়িটার ছাদে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে। এ শহরের স্কাইলাইন কলকাতার থেকে অনেকটাই আলাদা, আকাশচুম্বী ফ্ল্যাটগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে অনেকগুলো নাম না জানা সৌধের কারুকার্যময় চূড়া উঁকি দেয়। আমার অবশ্য এখনও কোনও জায়গাতেই যাওয়া হয়নি, সবে তো তিন মাস হল এসেছি এ শহরে। যতটুকু এ শহরটা সম্পর্কে জেনেছি, পুরোটাই বই পড়ে। বই পড়তে আমার ভীষণ ভালো লাগে, যদিও বেশিক্ষণ একটানা পড়লে মাথার পিছনের ব্যথাটা আবার ফিরে আসে। একটা পিন ফোটানোর মত অনুভূতি, দপদপে ব্যথা, আর তার সাথে ধাঁধিয়ে দেওয়ার মত আলো হঠাৎ করে এসে চোখের সামনে উজ্জ্বল একটা পর্দা ফেলে দেয়। আর তারপর... তারপর সেই পর্দা সরিয়ে যতই দেখতে চাই, মাথাটা কিছুতেই সঙ্গ দেয় না। অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল কলকাতাতেই। শুধু মনে আছে, হাসপাতালে যখন চোখ খুলেছিলাম. মুখের দিকে কতগুলো উদ্বিগ্ন মুখ তাকিয়ে ছিল একভাবে। কারা তারা তখনও ঠিক চিনি না। তবে, ভাসা ভাসা চোখের এক ছোট্ট মেয়ে সেই যে জড়িয়ে ধরল আমায়, সেই যে আমার বুকে মাথা ঠেকাল, সেই তখন থেকে বুঝেছিলাম আমি ওর মা। তার দৌড়ে এসে আমায় জাপটে ধরার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যে মনে হয়েছিল, তার নিঃশ্বাসটুকু সে যেন এইসময়টার জন্যই রোধ করে রেখেছিল। আস্তে আস্তে পুনর্পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হল। তমাল মিত্র, আমার স্বামী। মিতুল, আমার কন্যা। আমার বাবা, মা, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত আমার দাদা এদের সঙ্গেও দেখা হল বটে তবে খুব বেশি সময় পেলাম না ওদের সাথে। হাসপাতালে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে সমবেদনায় জড়ানো কটা শব্দ ছাড়া আমার মায়ের কাছে আর বিশেষ কিছু শুনতে পেলাম না। ভদ্রমহিলা আরও কাঁদতেন যদি না নার্স এসে তাকে চুপ করার জন্য বলত। আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল।

কান্নাকাটি, চিৎকার-চেঁচামেচি, যেকোনও জোরালো শব্দ আমি এখনও সহ্য করতে পারি না। টিভি সিরিয়ালের উচ্চগ্রাম শব্দেও আমার কষ্ট হয়। ডাক্তার বলেছেন, সময় লাগবে।

এই ঘটনার প্রায় পরপরই তমালকে কলকাতা থেকে চলে আসতে হল লখনউতে, পোস্টিংয়ের চিঠিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। কলকাতা থেকে সব পাট মিটিয়ে আমরা তিনজন অনির্দিষ্টকালের জন্য লখনউয়ের বাসিন্দা হয়ে গেলাম। এই শহরে পছন্দের মত এলাকা আর পছন্দের বাড়ি খুঁজে বার করতে একটু সময় লেগে গেল। ওর হট্টগোল একেবারে পছন্দ নয়, তাই এই পাড়াটা ও কেন আরও হাজারটা অপশন বাতিল করে বেছে নিয়েছে তা

বুঝতে অসুবিধা হয়নি আমার। লখনউয়ের এই পাড়াটা ভীষণ একটেরে। একটা নিরালা গলির মধ্যে সেকেলে কটা ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিটানো গম্বুজ খিলানআঁটা বাড়ির মধ্যে একটা, আমার এই নতুন আস্তানা। বাড়িগুলোর নামও অদ্ভুত! প্রায় দুমানুষ উঁচু পাঁচিলে মার্বেলের ট্যাবলেটে লেখা নামগুলো পড়লে বেশ নবাবী আমলের মেজাজটা ঘুরে ফিরে আসে। মোড়ের মাথার বাড়িটা মোতি মহল, তার পাশেরটা ফিরোজ মঞ্জিল, ডানদিকে বেশ খানিকটা দূরে রুহানে অমন, আর আমার দোতলা আস্তানাটির নাম নীলামহল। একটু সেকেলে নাম, কিন্তু আমার বেশ পছন্দই হয়েছে।

তমাল মিত্র, মানে আমার স্বামী, অতিরিক্ত দায়িত্বশীলতার মোড়কে মোড়া আদ্যোপান্ত কেজো মানুষ। ৯/এ বেণীনন্দন স্ট্রিটের ছোট্ট চৌহদ্দির বাইরে এসে সম্ভবত ওর কাজের চাপ আরও খানিকটা বেড়ে গেছে। বুঝতে পারি, মিতুল আর আমাকে নিয়ে ও খুব প্রোটেক্টিভ। উপরন্তু আমার এই আধা-অসুস্থ অবস্থায়, এই অনাত্মীয় জায়গায় ওর অনুপস্থিতিতে আমরা দুজন কীভাবে থাকব, কীভাবে দৈনন্দিনের রুটিনটা সেট হবে সেটা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তমালের চাকরিটায় প্রচুর ট্র্যাভেল, মাসে দু থেকে তিন বার, পাঁচ থেকে সাত দিনের জন্য। কলকাতার চাকরিটা ছাড়তে না হলে, হয়তো এই পরিস্থিতি হত না। কিন্তু ওর পক্ষে ব্রেন কনকাশনের রুগীকে চাকরিবাকরি সামলে দেখাশোনা করা সম্ভব হচ্ছিল না। আমার মায়ের পক্ষেও, দাদাকে ফেলে আমাকে দেখাটা অসম্ভব ছিল।

তাই লখনউয়ের এই চাকরিটা যখন ও পেল, তখন আমিই সাহস দিলাম। ঘটনার বেশ কদিন হয়ে গেছে, এখন নিশ্চয়ই সামলে নিতে পারব আমি। মিতুলকে তমাল চোখে হারায়, এখানে এসে থেকে তাই অন্তত ছজন হাউসমেডকে নাকচ করে শেষে আবিদা বলে এক আধাবয়স্ক মহিলাকে ঠিক করেছে আমার আর মিতুলের দেখভালের জন্য। তার অবশ্য দশ ঘন্টার ডিউটি। সাতটায় তমালের অফিস বেরোনোর আগে সে ঢোকে আর ঘড়ি ধরে পাঁচটায় বেরিয়ে যায়। মিতুলটা ছোটো, সবে চারবছর বয়স। এখন এখানে নতুন স্কুলে ভর্তির সময়ও পেরিয়ে গেছে। বেশিরভাগ স্কুলেই অক্টোবরের মধ্যে নেক্সট সেশনের অ্যাডমিশনের প্রসিডিওর সমাপ্ত হয়ে গেছে। অতএব, গোটা একটা বছর অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এখানে আসার আগে ও একটা নার্সারি স্কুলে পড়ত। আমি অসুস্থ হওয়ার পর বেচারীর সেখানে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুতভাবে মিতুল ওর পুরোনো স্কুলের গল্প করে না। ইন ফ্যাক্ট, মিতুল নতুন, পুরোনো কোনও গল্পই করে না। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলে ও হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালায়।